সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব

বিনয় ঘোষ

বিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সংস্কৃতির যে রূপায়ণ হয়, তার একটা বিশিষ্ট রীতি আছে। বিভিন্ন যুগের সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভব, প্রাধান্য ও প্রসার, মিলন মিশ্রণ ও সংঘাত, এবং গ্রহণ-বর্জন ও বিলোপের রীতির মধ্যেই সংস্কৃতির ইতিহাসের সমস্ত রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিস্ময় লুকিয়ে থাকে। বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণের কয়েকটি এই ধরনের রীতির এবং তার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বিষয় আমরা বিচার করব। কিন্তু তা করার আগে সংস্কৃতির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা দরকার।

যে-কোনো জাতির যে-কোনো দেশের বা অঞ্চলের সংস্কৃতিধারার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তিনটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে বিজ্ঞানীরা সাংস্কৃতিক উপাদানের স্থিতি (Persistence), সৃষ্টি (Invention) ও লয় (Loss) বলে অভিহিত করেছেন। অতীত কালের সংস্কৃতির অনেক উপাদান আমরা বংশপরম্পরায় দীর্ঘকাল ধরে বহন করে চলি, সহজে ছাড়তে পারি না, এমনকি সজ্ঞানে চেষ্টা করেও তার প্রভাবমুক্ত হতে ব্যর্থ হই। মনের অবচেতন গুহায় সেগুলি লুকিয়ে থাকে, সুযোগ মতো বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের অভ্যাস আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ধ্যানধারণা, উৎসব পার্বণ অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করে দেখলে, অতীত সংস্কৃতির অনেক মৃত উপাদানের জীর্ণ কংকালের সন্ধান পাওয়া যায়। মনে হয়, মানুষের মানসলোক একটা প্রাচীন গোরস্থানের মতো, যেখানে অতীতকালের বহু মৃত ধ্যানধারণার ভূতপ্রেত যেকোনো সময় দৌরাত্ম্য করার জন্য যেন ওৎ পেতে রয়েছে। যেমন 'গুরুবাদ' বহুকালের অতীত সংস্কৃতির একটি উপাদান হলেও, আধুনিককালে সাধু-পীরদের আস্তানা থেকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পর্যন্ত তার প্রভাব যথেষ্ট আছে দেখা যায়। তাবিচ-কবচের আধিপত্য বিজ্ঞানের যুগে অবশ্যই কমেছে ও কমছে, কিন্তু আজও তা কেন একেবারে লোপ পায়নি ভাবলে অবাক হতে হয়, বিশেষ করে শিক্ষিতদের মধ্যে। সংস্কৃতির এই দীর্ঘস্থিতির বৈশিষ্ট্যকে 'পার্সিস্টেন্স' বলা হয়।

সংস্কৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, নূতনের উদ্ভাবন, আবিষ্কার বা সৃষ্টি। যুগে-যুগে সমাজের তাগিদে নূতন-নূতন সাংস্কৃতিক উপাদান উদ্ভাবিত হয়, এবং তার ঘাতপ্রতিঘাতে

ধীরে ধীরে পুরাতনের ভাঙন ও নূতন ধারার গড়ন শুরু হয়। নূতন-পুরাতন উপাদানের মিল-মিশ্রণের ভিতর দিয়ে নূতন-নূতন 'কালচার-কমপ্লেক্সের' সৃষ্টি হয়। ক-খ-গ উপাদানের সঙ্গে যখন নূতন ঘ-ঙ উপাদান মিশ্রিত হয়, তখন পূর্বের উপাদানের বিন্যাস বা সন্নিবেশ বদলে যায়, এবং তার ফলে উপাদানান্তর্গত এবং সন্নিবেশগত তাৎপর্যও রূপান্তরিত হয়। সংস্কৃতিকে এই কারণে configuration বলা হয়, এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভাবন ও বিলোপের ফলে এইজন্যই মৌল সংস্কৃতির তাৎপর্যান্তর ঘটে, কেবল একটা সমষ্টি থেকে দু-একটি উপকরণের যোগবিয়োগ হয় না। নূতন সামাজিক পরিবেশে পুরাতন সংস্কৃতির অনেক অনাবশ্যকীয় উপাদান লোপ পেয়ে যায়। এই লয়শীলতা সংস্কৃতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয় হল, সৃষ্টিশীলতা ও লয়শীলতা সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার পরিচায়ক, এবং এই দুটি বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত শক্তি তার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীলতার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল।

সাংস্কৃতিক স্থিতিরই একটা বড় দিক হল 'ট্র্যাডিশন' বা ঐতিহ্য। সাধারণত সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণের প্রবাহকে আশ্রয় করেই ঐতিহ্যের প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। সংস্কৃতির কালিক প্রবাহ হল ঐতিহ্য। তা ছাড়া, সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রবাহও আছে, যাকে 'ডিফিউসন' বলা হয়। সাংস্কৃতিক ট্র্যাডিশনের গতি কালিক বলে 'ভার্টিক্যাল', এবং 'ডিফিউসনের' গতি ভৌগোলিক বলে 'হরাইজন্টাল'। সংস্কৃতির গভীরতা হল 'ট্র্যাডিশন', এবং প্রসারতা হল 'ডিফিউসন'। একটির গতি কাল থেকে কালান্তরের দিকে, অন্যটির গতি দেশ থেকে দেশান্তরের দিকে। বাংলাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ, এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত সংস্কৃতির যে প্রবাহ, তা হল 'ডিফিউসনের' বা প্রসারণের ব্যাপার। কিন্তু বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য বণিক গোপ সদগোপ মাহিষ্য কৈবর্ত, অথবা হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব কৌলিক ও সাম্প্রদায়িক সংস্কারের অস্তিত্ব দেখা যায়, সেগুলিকে ঐতিহ্যগত সংস্কার বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা সেইজন্য সাংস্কৃতিক প্রসারণ বা diffusion-কে বলেন 'inter-societal transmission of culture in space', এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা tradition-কে বলেন 'intra-societal transmission of culture in time.'

উদ্ভাবন যেমন সংস্কৃতির ধর্ম, প্রসারণ তেমনি সংস্কৃতির প্রাণশক্তি। সামাজিক বা ঐতিহাসিক অবস্থান্তরের জন্য যখন নূতন কোনো সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভব হয়, তখন তার প্রসারের গতিপথ যদি কোনো কারণে রুদ্ধ হয়ে যায়, অথবা সমান গতিতে সমাজের সর্বস্তরে না প্রসারিত হতে পারে, তাহলে সংকট দেখা দেয়। যদি ভৌগোলিক কারণে, সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থানের জন্য নব্যসংস্কৃতির প্রসারে বাধা সৃষ্টি হয়, এবং কেন্দ্রবহির্ভূত কোনো অঞ্চলের সংস্কৃতি সেই কারণে অনুন্নত থাকে তাহলে তাকে বিজ্ঞানীরা 'মার্জিন্যাল কালচার' বা 'প্রান্তীয় সংস্কৃতি' বলেন।

Cultures are retarded because of their peripheral or marginal position in geography. (Kroeber)

সংস্কৃতির ডিফিউসন বা প্রসারণের গতি হল, কেন্দ্র বা 'সেন্টার' থেকে 'মার্জিন' বা প্রান্তের দিকে। কিন্তু এই গতির কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কেন্দ্র থেকে বাইরের প্রান্তের ব্যবধান যত বেশি হবে, সংস্কৃতির প্রসার হতেও যে তত বিলম্ব হবে, এমন কোনো কথা নেই। সাধারণত তাই হবার কথা, কিন্তু তা নাও হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, কেন্দ্রের খুব কাছাকাছি অঞ্চল দূরের অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি অনগ্রসর। যেমন, কলকাতা শহরের সীমানা থেকে পাঁচ-সাত-দশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত হাওড়া ও চব্বিশ-পরগণা জেলার বহু গ্রামাঞ্চল বর্ধমান-মুর্শিদাবাদের তুলনায় অনেক বেশি অনুন্নত। তাছাড়া, কলকাতা শহরের মধ্যেই এমন অনেক পাড়া আছে যেখানে শহরের উন্নত শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ পড়েনি দেখা যায়। কোনো উন্নত সংস্কৃতিকেন্দ্রের সীমানার মধ্যে এই ধরনের কোনো অনুন্নত অঞ্চল থাকলে তাকে 'ইন্টার্নালি মার্জিন্যাল' বলা হয়। কারণ

> Some cultures remain retarded even though they are situated within the sphere of higher productive centres, and therefore they are called *internally marginal*.

সংস্কৃতির এই 'internal marginality' বা আন্তর্প্রান্তিকতা যানবাহন ও চলাচল-ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য ঘটতে পারে, আবার সমাজের শ্রেণীগত পার্থক্য এবং জাতিবর্ণগত দূরত্বের জন্যও ঘটতে পারে।

প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরাই বুঝতে পারবেন, বাংলার সংস্কৃতির এই প্রান্তীয়তার বা মার্জিন্যালিটির সমস্যা খুব বড় সমস্যা। বাইরের ও ভিতরের, দুই ধরনের প্রান্তীয়তাই বাংলার সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। বাইরের প্রান্তীয়তার কারণ ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব (Spatial isolation and distance) এবং ভিতরের প্রান্তীয়তার কারণ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান (Social isolation and distance)। এই দুই প্রকারের বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান দূর করতে না পারলে, বাংলা দেশের বিভিন্ন সামাজিক স্তরেও ভৌগোলিক অঞ্চলে সাংস্কৃতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না, এবং তা না প্রতিষ্ঠিত হলে জাতীয় উন্নয়নের কাজকর্ম পদে-পদে ব্যাহত হবে।

কমবেশি সব যুগেই দেখা যায়, যুগসংস্কৃতির কতগুলি বড়-বড় কেন্দ্র থাকে। মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহদের দরবার ও শাসনকেন্দ্রই ছিল প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র। বাংলা দেশে যেমন ছিল গৌড়, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ইত্যাদি। তার বাইরে ছিল চিরপ্রবহমান গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারা। দরবারী সংস্কৃতি বা 'কোর্ট-কালচার' এবং এই গ্রামীণ সংস্কৃতি,

যা প্রধানত 'ফোক-কালচার', দুটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হত। রাজদরবার বা রাজধানী থেকে বাইরে গ্রামাঞ্চলের দিকে কোর্ট-কালচার যে কদাচ বিচ্ছুরিত হত না তা নয়। হত বটে, কিন্তু সেই বিচ্ছুরণ প্রায় দৈবঘটনার সামিল ছিল বলা যায়। তার কারণ, একালের মতো সেকালে যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার আদৌ কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না। এই যোগাযোগের অভাবজনিত বিচ্ছিন্নতার জন্যই বাংলার গ্রাম্যসমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বনির্ভরতা। আধুনিক কালেও দেখা যায়, সেই রাজধানীই যুগসংস্কৃতির প্রধানকেন্দ্র বা হেডকোয়ার্টার হয়ে রয়েছে, তবে যানবাহনের ও যোগাযোগের প্রসারের ফলে আরও অনেক সাংস্কৃতিক উপকেন্দ্র গড়ে উঠেছে বাইরে। এইসব উপকেন্দ্র থেকে সংস্কৃতিধারা শাখাপ্রশাখা মেলে ক্রমে পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এবং গত প্রায় একশো বছরের উপর রেলগাড়ি ও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর অটোমোবিলের চলাচলের পরেও, পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তীয় সংস্কৃতি-অঞ্চল এত বেশি সংখ্যায় আজও রয়েছে, যা বাস্তবিকই ভয়াবহ বলে মনে হয়। কলকাতা শহর থেকে পঁচিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এখনও এমন সব গ্রাম আছে যেখানে সপ্তাহে একদিন বা দুদিন চিঠি বিলি হয়, এবং ডুলিতে করে লোকে চলাফেরা করে। হাওড়া জেলাতেই এরকম বহু গ্রাম আজও রয়েছে। এইসব গ্রামের অতি-বৃদ্ধদের সঙ্গে কথাবার্তা বললে মনে হয় যেন সভ্যতার আদিকালের কোনো প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সঙ্গে কথা বলছি। কলকাতা বা হাওড়া শহর কেন্দ্র করে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল 'রেডিয়াস' নিয়ে যদি একটা বৃত্ত টানা যায়, তাহলে বড়-বড় কয়েকটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের মধ্যেই এই ধরনের কয়েকটি প্রান্তীয় অঞ্চল দেখা যাবে। এগুলি অবশ্য ভৌগোলিক প্রান্তীয়তার নিদর্শন। অটোমোবিলের যুগে এই প্রান্তীয়তা ধীরে-ধীরে লুপ্ত হবার কথা, কিন্তু বাংলার গ্রামাঞ্চলের বিচ্ছিন্ন অচলতা আজও অটোর স্বতঃস্ফূর্ত গতি একেবারে ভাঙতে পারেনি। তা ভাঙতে না পারলে, এবং গ্রাম শহর-নগরের মতো সচল ও গতিশীল না হলে, জাতির সংস্কৃতি কখনও জনসাধারণের সম্পদ হবে না, মুষ্টিমেয়র ভোগবিলাসের সামগ্রী হয়ে থাকবে। তার চেয়েও ক্ষতিকর ফল হবে এই (এবং যা অধিকাংশ প্রান্তীয় গ্রামাঞ্চলে হয়েছে দেখা যায়) যে, নগর-শহরের পাঁচমিশালির সংস্কৃতির তলানিটুকু চুঁইয়ে এসে প্রান্তীয় অঞ্চলের জড়ত্বকে আরও বেশি বিষিয়ে তুলবে। নাগরিক সংস্কৃতির ভালটুকুর বদলে মন্দটুকুই তার ভাগ্যে জুটবে, এবং সেই মন্দের বিষক্রিয়ায় জর্জরিত হয়ে উঠবে তার জড়জীবন। বাংলাদেশের প্রান্তীয় গ্রামাঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরাই একথা উপলব্ধি করতে পারবেন।

উন্নত সংস্কৃতিকেন্দ্রের বাইরের এই ভৌগোলিক প্রান্তীয়তা ছাড়াও বাংলার সংস্কৃতির ভিতরের প্রান্তীয়তা কম নেই। বাইরের তুলনায় ভিতরের এই ব্যবধান আরও

অনেকগুণ বেশি ভয়াবহ। বাইরের প্রান্তীয়তার কারণ ভৌগোলিক দূরত্ব, কিন্তু কোনো সংস্কৃতিবৃত্তের ভিতরের প্রান্তীয়তার প্রধান কারণ 'সামাজিক দূরত্ব' (Social distance)। ভৌগোলিক দূরত্ব যান্ত্রিক যানবাহনের সাহায্যে অপসারিত করা সম্ভব ও সহজ, কিন্তু সামাজিক দূরত্ব সহজে দূর করা যায় না। একথা অবশ্য ঠিক যে ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচে গেলে এবং সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারণের বা 'হরাইজন্টাল ডিফিউসনে'র গতি বাড়লে, বিভিন্ন লোকস্তরের সামাজিক দূরত্বও ধীরে-ধীরে কমতে থাকে, কিন্তু সেই কমা না-কমার ব্যাপার অনেকাংশে নির্ভর করে দূরত্বের ধরনের উপর। বিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করেন যে সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারণ তার ঊর্ধ্বাধ বা 'ভার্টিক্যাল' গভীরতাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু অত্যন্ত মন্থর গতিতে বিলম্বিত তালে করে, কারণ সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ও জাতিবর্ণবিন্যাসের উপর সংস্কৃতির ঊর্ধ্বাধ প্রসারণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। নূতন সংস্কৃতির ঐহিক ও মানসিক উপাদান যখন কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে প্রসারিত হতে থাকে, তখন সেই যুগের সমাজের সচেতন উপরের জনস্তরের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে, তার নিচে খুব বেশি গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। এইজন্যই দেখা যায়, বিভিন্ন যুগে সমাজের মুষ্টিমেয় লোকই 'সমসাময়িক' সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

The fact is that only a handful of people in any age are its true contemporaries. Only sluggishly do the mass of people respond to the currents that are sweeping through the ruling classes or the intellectual elite; if this is mainly true even today, it was more so before universal literacy had quickened the space of communication. (Lewis Mumford).

প্রত্যেক যুগে মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর লোকই তাঁদের কালের গতিশীল সংস্কৃতির মুখপাত্র হন, এবং তাঁদেরই কেবল সেই যুগের বিচারে 'সমসাময়িক' বলা যায়। নূতন যুগের আবির্ভাবকালে সংস্কৃতিকর্মের বেশির ভাগ উদ্যম তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তার শতাংশের একাংশও বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। তার কারণ, সংস্কৃতির বাহনগুলির বিকাশ আগের যুগে তো হয়ইনি, আধুনিক জনশিক্ষার যুগেও তার বিকাশ নানাকারণে ব্যাহত হয়েছে। যুগে-যুগে যুগ-সংস্কৃতির মুষ্টিমেয় প্রবর্তকশ্রেণীর সঙ্গে বৃহত্তর লোকসমাজের ব্যবধান তাই ক্রমে দুস্তর হয়েছে। প্রাচীন যুগের চেয়ে মধ্যযুগে ব্যবধান বেড়েছে, এবং তার চেয়ে আরও অনেক বেশি বেড়েছে আধুনিক যুগে। তার কারণ, সংস্কৃতির অগ্রগতির বেগ যত বেড়েছে, সমাজের শ্রেণীগত দূরত্ব ও জাতিবর্ণগত দূরত্বের সেই অনুপাতে অবসান হয়নি। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসার যত বেড়েছে, সামাজিক গভীরতা সেই অনুপাতে বাড়েনি। ভাবগত ও বাস্তব উপাদানগত সংস্কৃতিসম্পদ থেকে বৃহত্তর জনসমাজ তাই ক্রমেই বঞ্চিত হয়েছে।

বাংলার সমাজে আধুনিক যুগসংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসারও ব্রিটিশ আমলে ব্যাহত হয়েছে, তার কারণ, স্বাভাবিক গতিতে সংস্কৃতির টেক্‌নোলজিক্যাল উপাদানের বিকাশের পথে (যেমন যানবাহন, কলকারখানা, শহর-নগর ইত্যাদি) তাঁরা নানারকমের অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। তার ফলে বাংলার গ্রাম্যসমাজের সঙ্গে একালের নাগরিকসমাজের ব্যবধান ক্রমে বেড়েছে, এবং বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির আঞ্চলিক বৃত্তগুলি যুগ-সংস্কৃতির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমে বিকৃতি, অবনতি, এবং অনেক ক্ষেত্রে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেছে। 'ট্রাইবাল' যুগ থেকে মধ্যযুগের সংস্কৃতির অনেক উপাদান আধুনিক যুগের গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যেও স্বচ্ছন্দে মিলেমিশে রয়েছে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, আধুনিক যুগের অন্যতম সাংস্কৃতিক লক্ষণ হল, মনের বিকেন্দ্রণ (delocalisation of mind)। আধুনিক লোকমানসের বিকাশের স্বাভাবিক গতি এই বিকেন্দ্রণের দিকে, কিন্তু এর কোনও চিহ্ন বাংলার গ্রাম্যসমাজে আজও বিশেষ দেখা যায় না।

বাংলার সমাজে (এবং ভারতীয় সমাজেও) সংস্কৃতির 'ভার্টিক্যাল' প্রসারের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়গত সামাজিক বৈষম্য। এই বৈষম্যই আমাদের দেশে সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারণ বললে অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক যুগের শ্রেণীগত দূরত্বের সঙ্গে এই জাতিবর্ণগত দূরত্ব মিলিত হয়ে এমন একটি কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে, যা পাশ্চাত্ত্য বা অন্য কোনো সমাজে বিরল বলা চলে। সংস্কৃতির 'ভার্টিক্যাল' প্রসারের পথে এই প্রবল অন্তরায় যতদিন না অপসারিত করা সম্ভব হবে, ততদিন কেবল সংস্কৃতির 'হরাইজন্টাল' প্রসারে সমস্যার সমাধান হবে না। বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণে জাতিবর্ণসম্প্রদায়ের এই সামাজিক দূরত্বই সবচেয়ে শক্তিশালী ঐতিহাসিক কারণরূপে কাজ করেছে। মানসিক বিকেন্দ্রণের মতো, বিজ্ঞানীরা বলেন, আধুনিক সংস্কৃতির স্বাভাবিক গতি হল সামাজিক দূরত্বলোপের দিকে (Social de-distantiation)। সংস্কৃতিবিচারের দিক থেকে এই সামাজিক স্তরীয় দূরত্বের গুরুত্ব কতখানি সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর মত হল,

Another important example of social distance is the vertical distance between hierarchical unequals...This is reflected in an enormous number of behaviour patterns developed by hierarchically stratified societies...In the sociology of culture the problem of vertical distance and distantiation is, of course, paramount. It is important to see that vertical distantiation may concern, not only the mutual relationship of two groups, but also the relationship between a person or group and inanimate objects of cultural significance. (Karl Mannheim).

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জাতি-বর্ণ-উপজাতির সামাজিক স্তরবিন্যাস এত দৃঢ় ও গভীর

যে সেখানকার গ্রামীণ সংস্কৃতির একটা কোনো নিটোল রূপ সহজে নজরে পড়ে না। তার মধ্যে অনেক পরস্পরবিরোধী ধারা-উপধারা ও উপাদান মিশ্রিত হয়েছে। জাতিবর্ণ-ভেদে একই উৎসবের ও একই বস্তুর সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের তারতম্য আছে দেখা যায়। আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও ধ্যান-ধারণার পার্থক্য তো আছেই। গ্রামীণ সংস্কৃতি বলতে কতকগুলি বাঁধাধরা বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি বোঝায়, এরকম একটা কেতাবী ধারণা আমাদের অনেকের মনে আছে। কিন্তু সরজমিনে যাঁরা সেই সংস্কৃতির বিচারবিশ্লেষণে অগ্রসর হবেন, তাঁরাই তার জটিলতায় ও বৈচিত্র্যে বিস্মিত হবেন। এই জটিলতা ও বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ হল, গ্রাম্য-সমাজের জাতিবর্ণগত স্তরবিন্যাস এবং বিভিন্ন জনস্তরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আধুনিক শ্রেণীদূরত্বকেও এই সামাজিক দূরত্ব ছাড়িয়ে গেছে। এমন অনেক গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে আজও আছে যেখানকার বসতিবিন্যাসের মধ্যে বর্ণপ্রাধান্য স্পষ্টরূপে দেখা যায়, কিন্তু শ্রেণীপ্রাধান্য (যা শহরে দেখা যায়) বিশেষ দেখা যায় না। অন্তত শহরের মতো বসতিবিন্যাসের মধ্যে তা প্রতিফলিত নয়। একই বর্ণের ও জাতি-উপজাতির ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্রের বাস এক-অঞ্চলে। পরিষ্কার বোঝা যায়, জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়ের (হিন্দু-মুসলমান) সামাজিক দূরত্ব আধুনিক শ্রেণীদূরত্বের চেয়ে অনেক বেশি দুস্তর। এই সামাজিক দূরত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবার ফলে বিভিন্ন জাতিবর্ণের মধ্যে একটা দুস্তর মানসিক দূরত্বও রচিত হয়েছে। গ্রাম্য উৎসব-পার্বণের বাইরের মেলামেশায়, অথবা গ্রাম্য জীবনের সরল প্রীতির সম্পর্কের আবরণে অনেক সময় এই সামাজিক দূরত্ব ঢাকা থাকে। কিন্তু হাজার মেলামেশাতেও যে গ্রামের বিভিন্ন জনস্তরের মানসিক দূরত্ব ঘুচে যায়নি তা যে-কেউ গ্রামের মধ্যে পা দিলেই বুঝতে পারবেন। বৈজ্ঞানিক অর্থে এই সামাজিক দূরত্বকে 'মানসিক ব্যবধান' বললেও ভুল হয় না। একজন বিখ্যাত মানস-বিজ্ঞানী সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই 'সামাজিক দূরত্বে'র প্রত্যয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। একটি জাহাজ ক্রমে বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে। বন্দরের শহরটিও স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। এমন সময় গভীর কুয়াশায় ঢেকে গেল চারিদিক। মনে হল, শহরটা যেন ঝাপ্‌সা হয়ে অনেক দূরে সরে গেল। একেই বলে 'ডিস্ট্যান্টিয়েশন'।

This is 'distantiation', for the town remains spatially near; it becomes more distant only in a psychological sense. (E. Bullough).

কুলগত বর্ণগত জাতিগত ও সম্প্রদায়গত অজস্র সংস্কারের কুয়াশা বিভিন্ন জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়কে পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। একই গ্রামে বা একই অঞ্চলে অনেক কাছাকাছি বংশানুক্রমে বাস করেও মনের দিক থেকে তারা পরস্পরকে কাছে টানতে পারেনি। বাংলার গ্রাম্যসমাজের ও গ্রামীণ সংস্কৃতির (এবং সাধারণভাবে ভারতীয় সমাজেরও) এটা একটা কঠিন জটিল সমস্যা। স্থানিক দূরত্ব

না থাকলেও যে এই মানসিক দূরত্ব সহজে ঘুচবে, তা মনে হয় না। তা যদি ঘুচত, তাহলে একই গ্রামে ও অঞ্চলে উন্নত জাতিবর্ণের পাশাপাশি অসংখ্য অনুন্নত উপজাতি-বর্ণের অস্তিত্ব থাকত না।

এখানে সংস্কৃতিবিজ্ঞানের দিক থেকে একটি বড় প্রশ্ন অনেকের মনে জাগবে। প্রশ্নটি হল : সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসার হলেই কি তার সামগ্রিক উন্নতি সম্ভবপর? এই প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন হল: সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারের সঙ্গে ঊর্ধ্বাধ প্রসারের সম্পর্ক কি? সংস্কৃতিবিজ্ঞানে 'ডিফিউসনে'র প্রত্যয়টি অনুভূমিক প্রসারের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক উপাদানের ভৌগোলিক বিস্তরণই 'ডিফিউসন'। যান্ত্রিক যানবাহনের উন্নতি ও বিজ্ঞানের প্রগতির উপর এই ভৌগোলিক বিস্তার নির্ভরশীল। সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ও দূর প্রান্তে সাংস্কৃতিক উপাদানের ক্রমবিস্তার হতে পারে, কিন্তু যে সমাজের 'ভার্টিক্যাল মোবিলিটি' কম এবং স্তরীয় দূরত্ব খুব বেশি, সেই সমাজে তার দূরপ্রসারী কোনো প্রতিক্রিয়া না হবার সম্ভাবনাই অধিক। সুতরাং কেবল যান্ত্রিক যানবাহনের সাহায্যে সাংস্কৃতিক উপকরণ জনসমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে চলবে না। তার ফলে সমাজের ঊর্ধ্বাধ গতি খানিকটা বাড়বে ঠিকই, কিন্তু এতটা বাড়বে না যাতে দীর্ঘকালস্থায়ী সামাজিক দূরত্ব ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানসিক ব্যবধানের অবসান ঘটতে পারে। সেই ব্যবধান দূর করতে হলে জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন। যান্ত্রিক যানবাহনের সঙ্গে যদি শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানেরও বিস্তার হতে থাকে, যদি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানাদর্শের আলোক শহর-নগরের মূলকেন্দ্র থেকে সুদূর প্রান্তবর্তী গ্রামের সর্বনিম্ন জনস্তর পর্যন্ত পৌঁছয়, তাহলে সংস্কৃতির অনুভূমিক গতির সঙ্গে ঊর্ধ্বাধ গতিও বাড়তে পারে এবং তার সামগ্রিক সুসমঞ্জস রূপায়ণও সম্ভব হতে পারে।

বাংলার সংস্কৃতির রূপায়ণে ভৌগোলিক প্রসার এবং সামাজিক ও মানসিক দূরত্বের সমস্যা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক রূপায়ণের আরও একটি উল্লেখনীয় দিক আছে, যা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। সেই দিকটা হল, দুটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতিধারার বাহক দুটি বা ততোধিক জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য বা কাছাকাছি বসবাসের ফলে, দুই সংস্কৃতির ঘাতপ্রতিঘাতের ও মিলন-মিশ্রণের দিক। দুই সংস্কৃতির সান্নিধ্যজাত এই মিলনমিশ্রণ ও সমন্বয়কে বিজ্ঞানীরা বলেন 'অ্যাকালচারেশন'।

We mean by acculturation the processes whereby societies of different cultures are modified through fairly close and long-continued contact, but without complete blending of the two cultures. (Gillin and Gillin : *Cultural Sociology*)

'অ্যাকালচারেশনে'র সঙ্গে 'ডিফিউসনে'র সাদৃশ্য আছে, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শ আবশ্যক। কিন্তু 'ডিফিউসনে'র জন্য সান্নিধ্যের বা পাশাপাশি

অবস্থানের প্রয়োজন নাও হতে পারে। একটা নূতন আইডিয়া বা আদর্শ, অথবা সংস্কৃতির কোনো নূতন টেকনোলজিক্যাল উপাদান এক কেন্দ্র থেকে বহুদূর কেন্দ্রান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু 'অ্যাকালচারেশনে'র জন্য ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য একান্ত আবশ্যক। সংস্কৃতিমিশ্রণ ও সমন্বয় তিন রকমে হতে পারে : ১। দুটি ভিন্ন জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করে পরস্পরের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, এবং তার ফলে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিতও হতে পারে; ২। ভিন্‌দেশাগত লোকেরা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে সাংস্কৃতিক সান্নিধ্য ঘটাতে পারে; ৩। বিদেশীরা দেশ জয় করে বিজেতাদের উপর তাদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতেও পারে। সাধারণত এই তিন উপায়ে ভিন্ন সংস্কৃতির সান্নিধ্য ও মিলন-মিশ্রণ ঘটা সম্ভব হতে পারে।

বাংলার সাংস্কৃতিক রূপায়ণের ইতিহাসে এই মিলন-মিশ্রণের বা 'অ্যাকালচারেশনে'র গুরুত্ব খুব বেশি। ভারত-সংস্কৃতির ইতিহাসেও এর গুরুত্ব কম নয়। প্রাগিতিহাসের দিগন্তরেখা পর্যন্ত এর প্রভাব বিস্তৃত। পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ডাচ্-ফরাসী-ইংরেজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশীয় সংস্কৃতির সান্নিধ্য, সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে বাংলাদেশে। তা ছাড়া, নানা উপজাতির ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংস্পর্শের নিদর্শনও বাংলার সংস্কৃতিতে কম নেই। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংঘাতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল বাঙালী খ্রীষ্টানরা। বাঙালী মুসলমানদের সাধারণ জনস্তরে সাংস্কৃতিক মিশ্রণের নিদর্শন পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, এবং বাংলার হিন্দুসংস্কৃতি লোকায়ত স্তরে ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রভাব যথেষ্ট আছে দেখা যায়। বাংলার বহু লোকদেবতা ও পীরগাজী এই 'অ্যাকালচারেশনে'র সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তিরূপে গ্রামে-গ্রামে বিরাজ করছেন। বাংলা দেশের সাঁওতাল, মুণ্ডা, বাউরী প্রভৃতি অনেক উপজাতির সংস্কৃতির মধ্যে উন্নত হিন্দু-সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা যায়। এমনকি বৈষ্ণব-শাক্ত, শৈব-তান্ত্রিক প্রভৃতি ধর্মপন্থীরা এক-একটি অঞ্চলে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। সাংস্কৃতিক লেনদেন খুব বেশি পরিমাণে বাংলা দেশে হয়েছে বলে এখানে জাতিবর্ণগত সামাজিক দূরত্ব সাধারণ মানুষকে তেমন অনুদার ও সংকীর্ণচিত্ত করতে পারেনি। সামাজিক দূরত্বের জন্য অবশ্যই বিভিন্ন জাতিবর্ণের মানসিক প্রসার অনেকটা রুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু 'অ্যাকালচারেশনে'র বৈচিত্র্য সেই দুরত্বাবসানে বা 'সোশ্যাল ডি-ডিস্ট্যান্টিয়েশনে' বেশ খানিকটা সাহায্যও করেছে। 'অ্যাকালচারেশনে'র ধর্মই তাই। যে-কোনো দেশের সাংস্কৃতিক 'প্যাটার্ন' ও 'কমপ্লেক্সে'র উপর যদি ঘন ঘন ভিন্ন সংস্কৃতির তরঙ্গাঘাত হতে থাকে, তাহলে সে-দেশের সংস্কৃতি সহজে জড়ত্বলাভ করতে পারে না। বাংলার সংস্কৃতি এই কারণে, জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়গত সামাজিক দূরত্ব ও মানসিক ব্যবধানের মধ্যেও, দীর্ঘকাল ধরে তার সজীবতা কিছুটা বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু এই সজীবতা চিরস্থায়ী নয়। সামাজিক দূরত্ব অদূর ভবিষ্যতে লুপ্ত না হলে, তার

দেনা চক্রবৃদ্ধি-হারে তাকে শুধতে হবে। অতীতের লোকসংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস, অথবা সমাজের উচ্চশ্রেণীর উন্নতি-প্রগতির আওয়াজ, কোনো কিছুতেই তার অনিবার্য স্থবিরত্ব রোধ করা সম্ভব হবে না। কেবল ফাঁকা আওয়াজ এবং তার সঙ্গে দিকভ্রান্ত ব্যর্থ প্রয়াসই সার হবে। দিনে দিনে সংস্কৃতির মধ্যে নানারকমের অসঙ্গতি, বিরোধ ও বিশ্রী বিকৃতি দেখা দেবে, যা বর্তমানে কিছু-কিছু দেখা দিচ্ছে, এবং সমাজ শরীরের সর্বত্র তার বিষাক্ত প্রক্রিয়াও শুরু হবে। সমাজকল্যাণের জন্য তাই বাংলার যুগসংস্কৃতির অনুভূমিক ও ঊর্ধ্বাধ প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য, এবং সেই প্রসারের পথে ভৌগোলিক ও সামাজিক দূরত্বের সমস্ত অন্তরায় দূর করা আবশ্যক। তা না হলে অনিবার্য সংস্কৃতিসংকট সমগ্র বাংলার সমাজকে এক অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে, যা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না।